ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা ও সূত্র

ভাষার বহিরঙ্গগত কারণে ধ্বনি পরিবর্তন

বহিরঙ্গগত কারণে বিভিন্ন ভাষায় যেসব বহু বিচিত্র ধরনের ধ্বনি-

পরিবর্তন হয়েছে এবং হয়ে চলেছে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা তা পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে ধ্বনিপরিবর্তনের কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এবং এই সূত্রগুলিকে তাঁরা প্রধানত চারটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। যেমন—

১। ধ্বনির আগম
২। ধ্বনির লোপ
৩। ধ্বনির রূপান্তর ও
৪। ধ্বনির স্থানান্তর ও বিপর্যাস।

সুতরাং প্রত্যেক ধারায় ধ্বনিপরিবর্তনের বিভিন্ন সূত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ধারায় ধ্বনিপরিবর্তনের কয়েকটি প্রধান সূত্র নিয়ে ব্যাখ্যা করা হল।

ধ্বনির আগম :

ধ্বনির আগম আবার দু'রকম হয়—স্বরধ্বনির আগম ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগম। আগেই বলেছি শব্দের মধ্যে ধ্বনির স্থান (position) তিন রকম—আদি (initial), মধ্য (medial) ও অন্ত্য (final)। শব্দের মধ্যে যে স্থানে স্বর ধ্বনিটি এসে যুক্ত হয় সেই স্থানভেদ অনুসারে স্বরধ্বনির আগমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—আদিস্বরাগম (Vowel Prothesis), মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) ও অন্ত্যস্বরাগম (Catathesis)। এছাড়া কোনো-কোনো অপিনিহিতিও (Epenthesis) স্বরাগমের মধ্যে পড়ে।

আদিস্বরাগম (Vowel Prothesis) : সাধারণত শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-প্রস্তুতিরূপে বা উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্যে তার আগে একটা স্বরধ্বনি এনে ফেলা হয়। শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির এই আবির্ভাবকে বলে আদিস্বরাগম। যেমন—স্পৃহা > আস্পৃহা, স্কুল > ইস্কুল, স্টেবল (stable) > আস্তাবল, স্ত্রী > পালি ইত্থি।

মধ্যস্বরাগম / বিপ্রকর্ষ / স্বরভক্তি (Anaptyxis) : যুক্তব্যঞ্জনের অর্থ হল একাধিক ব্যঞ্জনের মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি না থাকা এবং ধ্বনিগুলির যুক্ত উচ্চারণ। এইরকমের যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারণ করা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কর্কশও বটে। যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণের কষ্ট লাঘব করার জন্যে বা তার উচ্চারণের কর্কশতা কমিয়ে তাকে মধুর করার জন্যে আমরা যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি এনে যোগ করি। যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে এইভাবে স্বরধ্বনির আবির্ভাবকে মধ্যস্বরাগম

বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে (Anaptyxis)। প্রকর্ষ মানে প্রকৃষ্ট আকর্ষণ। আর বিপ্রকর্ষ মানে এই প্রকৃষ্ট আকর্ষণ যে প্রক্রিয়ায় বিগত হয়েছে সেই প্রক্রিয়া। যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসার ফলে ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বিগত হয়ে যায়, ব্যঞ্জনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এইজন্যে এই প্রক্রিয়াকে বিপ্রকর্ষ বলে। আর এই প্রক্রিয়ায় স্বরধ্বনির প্রতি অধিক ভক্তি বা অনুরাগ দেখান হয় বলে একে স্বরভক্তিও বলে। উদাহরণ—ভক্তি > ভকতি (ভ্+অ+ক্+ত্+ই > ভ্+অ+ক্+অ+ত্—ই)। তেমনি মনোরথ > মনোরথ, গ্লাশ > গেলাশ, গার্ড > গারদ ইত্যাদি।

অপিনিহিতি (Epenthesis) : শব্দমধ্যস্থ 'ই' বা 'উ'-এর স্থানান্তরের ফলে যে একরকমের অপিনিহিতি হয় (যেমন—করিয়া > কইর‍্যা) তার কথা পরে আলোচনা করা হবে। এছাড়া শব্দমধ্যে য-ফলা (্য)-যুক্ত ব্যঞ্জন, 'জ্ঞ' বা 'ক্ষ' থাকলে তার আগে একটি 'ই'-এর আগম হয়। এই প্রক্রিয়াকেও অপিনিহিতি বলা হয়। এটিও আসলে একধরনের মধ্যস্বরাগম। উদাহরণ—পূর্ব বাংলার উচ্চারণে বাক্য > বাইক্ক, যজ্ঞ > যইগ্‌গ ইত্যাদি।

অন্ত্যস্বরাগম (Vowel Catathesis) : বাংলা ভাষায় শব্দের শেষে সাধারণত কোনো যুক্তব্যঞ্জন স্বর ছাড়া থাকে না, অর্থাৎ শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জনের পরে কোনো-না-কোনো স্বর অবশ্য থাকে। যেখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কোনো স্বর নেই সেখানেও শেষে 'অ' বা 'ও' উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় শব্দের শেষেও স্বরহীন যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারিত হয় ; যেমন—bench (বেন্চ্)। এইরকমের শব্দ যখন আমরা বাংলা ভাষায় গ্রহণ করি তখন বাংলা রীতি অনুযায়ী সেগুলির শেষে সাধারণত একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনি যোগ করে উচ্চারণ করি। এই প্রক্রিয়াকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন—বেন্চ্ (ব্+এ+ন্+চ্) > বেঞ্চি (ব্+এ+ন্+চ্+ই)। এইরকম গিল্ট্ (gilt) > গিল্টি, আরবী কিস্ত্ > কিস্তি। মধ্যভারতীয় ও নব্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দান্তিক একক ব্যঞ্জনের পরেও কখনো-কখনো অন্ত্যস্বরাগম দেখা যায়। যেমন—সংস্কৃত পরিষদ্ > পালি পরিসদা। সং দিশ্ > বাংলা দিশা।

আদি ব্যঞ্জনাগম (Consonant Prothesis) : শব্দের আদিতে ব্যঞ্জন-ধ্বনি যোগ হলে তাকে আদিব্যঞ্জনাগম (Consonant Prothesis) বলা যায়। তবে বাংলায় শব্দের আদিতে যে-কোনো ব্যঞ্জনের আগম হয় না,

সাধারণত শুধু 'র্'-এর আগম হয়ে থাকে ; এবং এই 'র্'-এরও আগম হয় শুধু সেই শব্দের গোড়ায় যে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি আছে। যেমন—ঋজু > উজু > রুজু (এখানে 'উ'-এর আগে 'র্'-এর আগম হয়েছে) ; উপাধ্যায় > প্রাকৃত উব্‌জ্‌ঝাঅ > বাংলা ওঝা > রোজা ('ও'-এর আগে 'র্'-এর আগম)।

অন্ত্যব্যঞ্জনাগম (Consonant Catathesis) : ডঃ সুকুমার সেনের মতে অন্ত্যস্বরাগমের মতো অন্ত্যব্যঞ্জনাগমও হতে পারে অর্থাৎ শব্দের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনিরও আগম হতে পারে। যেমন—সংস্কৃত সর্ব+জিৎ > সর্বজিৎ ; ভূ+ভূ > ভূভুৎ ; বাংলা খোকা > খোকন ; বাবু > বাবুন।

মধ্যব্যঞ্জনাগম / শ্রুতিধ্বনি (Glide) : শব্দের ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করার সময় আমাদের জিহ্বা অসাবধানতাবশত দু'টি ধ্বনির মাঝখানে কোনো অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে ফেললে সেই প্রক্রিয়াকে মধ্যব্যঞ্জনাগম বলে। এইভাবে যে অতিরিক্ত ধ্বনিটি শব্দের মাঝখানে উচ্চারিত হয়ে যায় তাকে শ্রুতিধ্বনি (Glide) বলে। যেমন—চা+এর (ষষ্ঠী বিভক্তি) > চায়ের (এখানে 'য়'-এর আগম হয়েছে) ; শৃগাল > সিআল ('গ্'-এর লোপ) > শিয়াল (এখানে 'য়'-এর আগম হয়েছে)। এইভাবে শব্দমধ্যে যে ব্যঞ্জনের আগম হয় সেই ব্যঞ্জনের নাম অনুসারে শ্রুতির নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন—

য়-শ্রুতি (y-glide) : মোদক > মোঅঅ ('দ্' ও 'ক্'-এর লোপ) > মোয়া ('য়্'-এর আগম) ; লোহ > *নোআ ('ল্' স্থানে 'ন্' উচ্চারণ এবং 'হ্'-এর লোপ) > নোয়া ('য়্'-এর আগম), ইত্যাদি।

ওয়-শ্রুতি (w-glide) : যা (= to go, ধাতু) + আ (প্রত্যয়) > যাওয়া ('ওয়্'-এর আগম) ; ইত্যাদি।

হ-শ্রুতি (h-glide) : সংস্কৃত বিপুলা > প্রাকৃত বিউলা ('প্'-এর লোপ) > বিহুলা ('হ্'-এর আগম) > বেহুলা ; পর্তুগীজ viola(violin) > *বেআলা > বেহালা ('হ্'-এর আগম) ইত্যাদি।

দ-শ্রুতি (d-glide) : বৈদিক সূনর > ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সুন্দর ('দ্'-এর আগম) ; সংস্কৃত বানর > প্রাচীন বাংলা বান্দর ('দ্-এর আগম) > আধুনিক বাংলা বাঁদর ; ইংরেজী General (জেনারেল্) > *জান্দরেল ('দ্'-এর আগম) > জাঁদরেল।

ব-শ্রুতি (b-glide) : সংস্কৃত তাম্র> *তম্‌ব্‌র ('ব'-এর আগম)> প্রাকৃত তম্ব>বাংলা তাঁবা, ইত্যাদি।

ধ্বনির লোপ :

আদিস্বরলোপ (Aphesis/Aphaeresis) : সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না থেকে যদি শব্দের মধ্যবর্তী কোনো অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকে তবে আদি স্বরধ্বনিটি গৌণ হয়ে ক্রমশ ক্ষীণ উচ্চারিত হয় এবং শেষে লোপ পায়। একেই আদিস্বরলোপ (Aphesis/Aphaeresis) বলে। যেমন—উদ্ধার>উধার>ধার ('উ' লোপ), অলাবু>লাউ ('অ' লোপ)।

মধ্যস্বরলোপ (Syncope) : সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়। একে মধ্যস্বরলোপ (Syncope) বলে। যেমন—গামোছা> গাম্‌ছা ('ও'-কার লোপ); সুবর্ণ (স্+উ+ব্+অ+র্+ণ্+অ)> স্বর্ণ (স্+ব্+অ+র্+ণ্+অ) ('উ'-কার লোপ) : সংস্কৃত সক্টিকা> প্রাকৃত সক্কডী>সকডী (স্+অ+ক্+অ+ড্+ঈ)>সক্‌ড়ী (স্+অ+ক্+ড়্+ঈ) ('অ'-কার লোপ)।

অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope) : স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রায়ই শব্দের শেষের দিকে শ্বাসের জোর কমে আসে এবং শব্দের শেষে অবস্থিত স্বর ক্ষীণ উচ্চারিত হতে-হতে শেষে লোপ পায়। যেমন—রাশি (র্+আ+শ্+ই)> রাশ (ই-কার লোপ); সংস্কৃত সন্ধ্যা>প্রাকৃত সঞ্‌ঝা>বাংলা সাঁঝ (স্+আঁ+ঝ্) (আ-কার লোপ)।

দ্বিমাত্রিকতা/দ্ব্যক্ষরতা (Bimorism/Bisyllabism) : শ্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় যতটুকু ধ্বনিগুচ্ছকে একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায় তাকে অক্ষর (Syllable) বলে। প্রত্যেক অক্ষরে একটি স্বরধ্বনি থাকবেই এবং কোনো অক্ষরে একের বেশী স্বরধ্বনি থাকবে না। অক্ষর (syllable) উচ্চারণে যে সময় লাগে সেই সময় পরিমাপের একক-কে মাত্রা (Mora) বলে। অক্ষর হ্রস্ব উচ্চারিত হলে এক মাত্রা, দীর্ঘ উচ্চারিত হলে দু' মাত্রা ও অতি দীর্ঘ (প্লুত) উচ্চারিত হলে আরো অধিক মাত্রা ধরা হয়। সাধারণত সংস্কৃতে হ্রস্ব স্বরান্ত অক্ষর একমাত্রা হয়। যেমন—নি (ন্+ই)=একমাত্রা। দীর্ঘস্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর দু'মাত্রা। যেমন—সং, ধী প্রত্যেকটি=দু'মাত্রা; অবশ্য বাংলায় সর্বক্ষেত্রে এমন হয় না। আর বাংলায় উচ্চারণের একটি প্রবণতা হল বড় শব্দকে এমন টুকরো-টুকরো অংশে ভাগ করে উচ্চারণ করা যাতে প্রত্যেক টুকরোতে দু'টি দু'টি করে অক্ষর (syllable) থাকে বা দু'য়ের গুণিতক অক্ষর থাকে। শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যবর্তী কোনো স্বর লোপ পেয়ে যায় আবার কখনো-কখনো মধ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের শেষের কোনো স্বর লোপ পেয়ে যায়, এরই ফলে বড় শব্দ দুই বা দু'য়ের গুণিতক সংখ্যক অক্ষরের এক-একটা টুকরোতে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয় অথবা শব্দটি যদি বে-জোড় সংখ্যার অক্ষরের (যেমন—তিন অক্ষরের) শব্দ হয় তবে সেটি জোড় সংখ্যার অক্ষরের শব্দে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা (Bimorism / Bisyllabism) বলে। বাংলায় বিভাজনটা ঠিক জোড়মাত্রা অনুসারে হয় না, জোড় অক্ষরের শব্দে হয়। তাই একে ঠিক দ্বিমাত্রিকতা না বলে দ্ব্যক্ষরতা বলাই ভাল। যেমন—গামোছা (গা+মো+ছা) (তিন অক্ষরের শব্দ)>গাম্‌ছা (গাম্+ছা) (দু'-অক্ষরের শব্দ); অপরাজিতা (অ+প+রা+জি+তা) (পাঁচ অক্ষরের শব্দ)>অপ্‌রাজিতা (অপ্+রা+জি+তা) (চার অক্ষরের শব্দ)।

ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ : স্বরধ্বনি যেমন শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্য যে-কোনো স্থান থেকেই লোপ পেতে পারে, ব্যঞ্জনধ্বনি তেমন লোপ পায় না। আদি ও অন্ত্য অবস্থান থেকে ব্যঞ্জন লোপের নিদর্শন নেই বললেই চলে। শব্দের আদিতে শুধু 'র্' ধ্বনি লোপের নিদর্শন পাওয়া যায়। উত্তর-বঙ্গের উপভাষায় আদি 'র্'-এর লোপ ও আদি 'র্' আগম দুই দেখা যায়। যেমন—'আমের রস'>সেখানকার উচ্চারণে 'রামের অস'। এছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পায় সাধারণত শব্দের মধ্যে দু'টি স্বরের মধ্যস্থান থেকেই। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন অনেক ক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। যেমন—সংস্কৃত রাজা (র্+আ+জ্+আ)>প্রাকৃত রাআ (র্+আ+আ) ('জ্'-এর লোপ)। তেমনি সখী>সহি>সই ('হ্'-এর লোপ), ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় 'বাবা'>জড়িত উচ্চারণে 'বাওবা'। যেমন—"কেন বাওআ কাঁচা পয়হা নষ্ট করছ? থাকলে পাঁচ রাত বস্রে ব'সে ঠিয়াটার দেখা চলত।" (—পরশুরাম : 'চিকিৎসা-সঙ্কট')। স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন (single consonant) ছাড়াও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগ্ম-ব্যঞ্জনের (double consonant) একটি ব্যঞ্জনও বাংলা ভাষায় লোপ পেয়েছে। যেমন—সংস্কৃত ভক্ত>মধ্য-ভারতীয় আর্য ভত্ত (ত্ত=ত্+ত্=যুগ্ম ব্যঞ্জন)>ভাত (দু'টি 'ত্' এর একটি লোপ পেল।) চলিত বাংলায় 'হ্' ধ্বনির লোপ প্রায়ই দেখা যায়। যেমন—খড়দহ (খ্+অ+ড়্+দ্+অ+হ্+অ)> *খড়দঅ (খ্+অ+ড়্+দ্+অ+অ) ('হ্' লোপ)>খড়দা। তেমনি—ফলাহার>ফলার।

বাংলায় অনুনাসিক ব্যঞ্জন লোপের নিদর্শন হিসাবে কেউ-কেউ উল্লেখ করেছেন পঙ্ক>পাঁক ইত্যাদি দৃষ্টান্ত, যেন এখানে 'ঙ্' লোপ পেয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক ধ্বনি লোপের দৃষ্টান্ত নয়, এটা ধ্বনির রূপান্তর। এখানে ঙ্ রূপান্তরিত হয়েছে অনুনাসিক ধ্বনিতে (ঁ)। এটা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া, নাম নাসিক্যীভবন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

সমাক্ষর লোপ (Haplology/Syllabic Syncope) : পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি সমধ্বনির মধ্যে একটি যখন লোপ পায় বা দু'টি সমধ্বনিযুক্ত অক্ষরের (syllable) মধ্যে একটি যখন লোপ পায় তখন তাকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন—বড় দাদা>বড়দা' (একটি অক্ষর 'দা' লোপ পেয়েছে)। পাদোদক>পাদোক (একটি ধ্বনি 'দ' লোপ পেয়েছে)।

সমবর্ণ লোপ (Haplography) : অনেক সময় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি সমবর্ণ বা সমাক্ষরের মধ্যে একটি শুধু লেখার বানানে লোপ পায়, কিন্তু লোকের মুখে উচ্চারণে ঠিকই থাকে। একে সমবর্ণ লোপ (Haplography) বলে। যেমন—ইংরেজীতে আগে কৃষ্ণনগর (Krishna-nagar) লেখা হত Krishnagar, একটি 'na' বাদ দিয়ে লেখা হত, কিন্তু লোকের মুখে দু'টি 'ন' ঠিকই উচ্চারিত হয়--ক্রিশ্নোনগোর [Kriʃnonsagor]।

ধ্বনির রূপান্তর :

ধ্বনি যখন লোপ পায় না বা নতুন কোনো ধ্বনির যখন আগম হয় না, যখন একটি ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অন্য ধ্বনির রূপ লাভ করে তখন তাকে ধ্বনির রূপান্তর বলা যায়। স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়বিধ ধ্বনিরই রূপান্তর হয়। স্বরধ্বনির রূপান্তরের প্রধান প্রক্রিয়া হল অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি ইত্যাদি। ব্যঞ্জনধ্বনির রূপান্তরের বহু বিচিত্র প্রক্রিয়া; তাদের মধ্যে প্রধান হল সমীভবন, বিষমীভবন ইত্যাদি।

অভিশ্রুতি (Umlaut) : অপিনিহিতির প্রক্রিয়ায় শব্দের অন্তর্গত যে 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে সরে আসে সেই 'ই' বা 'উ' যখন পাশাপাশি স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তার সঙ্গে মিশে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন তাকে অভিশ্রুতি (Umlaut) বলে। অভিশ্রুতি হল অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপ। যেমন-করিয়া (ক্+অ+র্+ই+য়্+আ)>কইর‍্যা (ক্+অ+ই+র্+য়্+আ)—যে 'ই' ছিল 'র্'-এর পরে তা এখানে 'র্'-এর আগে সরে এসেছে—এইটা অপিনিহিতি; কইর‍্যা (অপিনিহিতি)>করে (অভিশ্রুতি)—অপিনিহিতির ফলে যে 'ই' 'র্'-এর

আগে সরে এসেছিল সেই 'ই'-এর প্রভাবে য-ফলার পরবর্তী স্বরধ্বনি 'আ'-কার পরিবর্তিত হয়ে 'এ'-কার হয়ে গেছে এবং 'ই'কারটিও নিজে তার সঙ্গে মিশে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেসব শব্দ মূলত দু'অক্ষরের (bisyllybic) সেগুলির ক্ষেত্রে অভিশ্রুতির এই প্রক্রিয়াটি কার্যকর হয় না; যেমন—বাক্য, যজ্ঞ আজি প্রভৃতি দু'অক্ষরের শব্দের রূপান্তর অপিনিহিতি পর্যন্ত ঠিকই হবে,—বাইক্ক, যইগ্গ, আইজ; কিন্তু এর পরে অভিশ্রুতি হবে না; অপিনিহিতির ফলে যে 'ই' এসেছে, পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় সেটা শুধু লোপ পাবে। যেমন—[বাক্কো, যগ্গো, আজ]।

স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অথবা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দু'টি পৃথক্ স্বরধ্বনির মধ্যে যদি একটি অন্যটির প্রভাবে বা দু'টিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম স্বরধ্বনিতে বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) বলে। মৌলিক স্বরধ্বনি ও স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগের কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে বিভিন্ন প্রকার স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের জিহ্বা বিভিন্ন রকম অবস্থানে থাকে। দু'টি পৃথক্ অবস্থানের স্বর-ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের জিহ্বাকে মুখের মধ্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটোছুটি করতে হয়। এই পরিশ্রম লাঘব করার জন্যে আমরা দু'টি পৃথক্ অবস্থানের ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় সেই দু'টিকে যথাসম্ভব জিহ্বার একই রকম বা কাছাকাছি অবস্থান থেকে উচ্চারণ করে ফেলি; এরই ফলে স্বরসঙ্গতি সাধিত হয়। যেমন—'সুপারি' উচ্চারণ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকে যখন 'সুপুরি' উচ্চারণ করে ফেলে তখন 'সুপারি' (স্+উ+প্+আ+র্+ই) শব্দের দু'টি পৃথক্ স্বরধ্বনি ('উ' এবং 'আ') পরিবর্তিত হয়ে 'সুপুরি' (স্+উ+প্+উ+র্+ই) উচ্চারণে একই রকম ('উ' এবং 'উ') স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়; লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মূল শব্দের পৃথক্ স্বরধ্বনি দু'টোর ('উ' এবং 'আ') মধ্যে 'উ' উচ্চারিত হয় জিহ্বার উচ্চ অবস্থান থেকে আর 'আ' উচ্চারিত হয় জিহ্বার নিম্ন অবস্থান থেকে। এরকম দু'টি দূরবর্তী অবস্থান থেকে দু'টি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে হলে জিহ্বাকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে এই যে ছুটে যেতে হয়, এর পরিশ্রমটুকু কমাবার জন্যে আমরা 'আ'কেও 'উ'তে রূপান্তরিত করে ফেলি, তার ফলে 'সুপারি' শব্দটি উচ্চারিত হয় 'সুপুরি' রূপে এবং 'সুপুরি'-র দু'টি 'উ'-এর উচ্চারণ স্থান একই হওয়ায় জিহ্বার পরিশ্রম লাঘব হয়। স্বরসঙ্গতিতে দু'টি

পৃথক স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একেবারে একই রকম হয়ে গেলে তাকে **পূর্ণ স্বরসঙ্গতি** বলা যায়। যেমন—সুপারি > সুপুরি। স্বরসঙ্গতিতে অনেক সময় দু'টি পৃথক স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় না, প্রায় একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একে আংশিক স্বরসঙ্গতি বলা যায়। যেমন—পূজা (প্+উ+জ্+আ) > পুজো (প্+উ+জ্+ও)। 'উ' এবং 'আ' ছিল যথাক্রমে উচ্চ (High) এবং নিম্ন (Low) স্বরধ্বনি। এই দু'টির মধ্যে 'আ' পরিবর্তিত হয়ে 'উ'-এর কাছাকাছি উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি (High-mid vowel) 'ও'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা আংশিক স্বরসঙ্গতি।

স্বরসঙ্গতিকে ধ্বনিপরিবর্তনের গতিমুখ অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) প্রগত (Progressive), (খ) পরাগত (Regressive), (গ) পারস্পরিক বা অন্যোন্য (Mutual)। পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে বলে প্রগত (Progressive) স্বরসঙ্গতি। যেমন—পূজা > পুজো, দিশাহারা > দিশেহারা। পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে বলে পরাগত (Regressive) স্বরসঙ্গতি। যেমন—দেশী > দিশী ; ভুল + আ = *ভুলা > ভোলা (to forget)। যদি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দু'টি স্বরধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে তাকে পারস্পরিক বা অন্যোন্য (Mutual/Reciprocal) স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন—যদু > যোদো। এগুলি ছাড়া স্বরধ্বনির আরো একটি শ্রেণীর কথা কেউ-কেউ উল্লেখ করেছেন—মধ্যগত ; দু'পাশের দু'টি স্বরধ্বনির প্রভাবে তাদের মধ্যবর্তী অন্য কোনো ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে তাদের মধ্যে একই বা কাছাকাছি ধ্বনি হয়ে গেলে তাকে বলেছেন মধ্যগত স্বরসঙ্গতি। যেমন—বিলাতি > বিলিতি। কিন্তু এটা স্বরসঙ্গতির কোনো স্বতন্ত্র শ্রেণী নয়, এটা একই সঙ্গে প্রগত ও পরাগত স্বরসঙ্গতির মিশ্র প্রক্রিয়া। স্বরসঙ্গতির বিপরীত প্রক্রিয়া হল স্বরের অসঙ্গতি (Vowel Disharmony)। এই প্রক্রিয়ায় কাছাকাছি অবস্থিত দু'টি একই রকম স্বরধ্বনির মধ্যে একটি পৃথক হয়ে যায়। যেমন—মামা > মামু, কাকা > কাকু।

ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন বা পরিপূরক দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening) : শব্দের কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে অনেক সময় সেই লোপের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বরে রূপান্তরিত হয়। একেই বলে ক্ষতিপূরণ বা পরিপূরক দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening)। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জন মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় সমব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। যেমন—সপ্ত > সত্ত। এই সমব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় লোপ পেল এবং তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হল। যেমন—সত্ত (স্+অ+ত্+ত্+অ) > সাত (স্+আ+ত)। এখানে দু'টি 'ত্'-এর মধ্যে একটি লোপ পেয়েছে এবং তার ফলে 'অ'-এর দীর্ঘীভবন হওয়ায় এটি 'আ' হয়ে গেছে। তেমনি ধর্ম > ধম্ম > ধাম, কর্ম > কম্ম > কাম।

সমীভবন (Assimilation) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত দু'টি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ পৃথক ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একে অপরের প্রভাবে বা দু'টিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনিতে বা প্রায় অনুরূপ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে সমীভবন (Assimilation)। যেমন—উৎ + লাস > উল্লাস (এখানে 'ল্'-এর প্রভাবে 'ৎ' পরিবর্তিত হয়ে 'ল্'-এর সঙ্গে একই রকম ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে)। তেমনি সংস্কৃত যক্ষা (য্+অ+ক্+ষ্+আ) > খাঁটি বাংলা উচ্চারণে 'যক্খা' (য্+অ+ক্+খ্+আ) (এখানে 'ক্'-এর প্রভাবে 'ষ্' পরিবর্তিত হয়ে 'ক্'-এর প্রায় কাছাকাছি ধ্বনি 'খ্'তে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বরসঙ্গতির মতো সমীভবনও পূর্ণ এবং আংশিক দু'রকমেরই হতে পারে। 'উল্লাসে'-এ 'ৎ' পরিবর্তিত 'ল্'-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একই রকম ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে ; এখানে পূর্ণ সমীভবন হয়েছে। কিন্তু 'যক্খা'-তে 'ষ্' পরিবর্তিত হয়ে 'ক্'-এর সঙ্গে পুরোপুরি একই রকম ধ্বনি হয়ে যায় নি, উচ্চারণের দিক থেকে প্রায় কাছাকাছি ধ্বনি 'খ্'-তে পরিণত হয়েছে। এখানে 'ক্' ও 'ষ্'-এর মধ্যে 'ক্' ছিল জিহ্বামূল থেকে উচ্চারিত আর 'ষ্' ছিল মূর্ধা থেকে উচ্চারিত ধ্বনি। এই দু'টির সমীভবন হওয়ার ফলে 'ক্' ও 'খ্' দু'য়েরই উচ্চারণ-স্থান হয়েছে জিহ্বামূল। এখানে সমীভবন হয়েছে উচ্চারণ-স্থানের দিক থেকে। আরো একদিক থেকে সমীভবন হয়েছে। 'ক্' ও 'ষ্' ছিল যথাক্রমে স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনি। সমীভবনের ফলে 'ক্' ও 'খ্' দু'টিই হয়েছে স্পর্শ ধ্বনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে পূর্ণ সমীভবন হয় নি। 'ক্' হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি, কিন্তু 'খ্' হল মহাপ্রাণ। এইটুকু পার্থক্য থেকেই গেছে। সেই জন্যে এখানে আংশিক সমীভবন হয়েছে মাত্র।

সমীভবনে ধ্বনিপরিবর্তনের গতিমুখ অনুসারে সমীভবনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—প্রগত, পরাগত এবং অন্যোন্য বা পারস্পরিক। পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে যদি কখনো পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে প্রগত সমীভবন (Progressive Assimilation) বলে। যেমন—পদ্ম>পদ্দ (এখানে পূর্ববর্তী ধ্বনি 'দ্'-এর প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি 'ম্' পরিবর্তিত হয়ে 'দ্' হয়ে গেছে)। তেমনি—সূত্র (স্+উ+ত্+র্+অ)>সূত্ত (স্+উ+ত্+ত্+অ)। পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি যদি কখনো পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনি বা কাছাকাছি ধ্বনি হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে পরাগত সমীভবন (Regressive Assimilation) বলে। যেমন—সং+মান>সম্মান (এখানে দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী ধ্বনি 'ম্'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি 'ং' পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনি 'ম্'-তে পরিণত হয়েছে)। তেমনি—ধর্ম (ধ্+অ+র্+ম্+অ)> ধম্ম (ধ্+অ+ম্+ম্+অ); ভক্ত (ভ্+অ+ক্+ত্+অ)>ভত্ত (ভ্+অ+ত্+ত্+অ); বড় ঠাকুর>বট্‌ঠাকুর। পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যদি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দু'টি ধ্বনিই পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনি বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন (Mutual/Reciprocal Assimilation)। যেমন—উৎ+শ্বাস>উচ্ছ্বাস —এখানে পূর্ববর্তী ধ্বনি 'ৎ' ও পরবর্তী ধ্বনি 'শ্' দু'টিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে কাছাকাছি বা প্রায় একই রকম ধ্বনি 'চ্' ও 'ছ্'-তে পরিণত হয়েছে। তেমনি—সত্য>সচ্চ>হিন্দী সচ্চা>বাংলা সাচ্চা; কুৎসা>কেচ্ছা; মহোৎসব>মোচ্ছব ইত্যাদি।

বিষমীভবন (Dissimilation): সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হল বিষমীভবন। এই প্রক্রিয়ায় দু'টি সংযুক্ত বা কাছাকাছি অবস্থিত সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে বিষম অর্থাৎ পৃথক্ ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। যেমন—পর্তুগীজ আর্মারিও (আ+র্+ম্+আ+র্+ই+ও)>বাংলা আলমারি (আ+ল্+ম্+আ+র্+ই) (দু'টি 'র্'-এর মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে 'ল্' হয়ে গেছে)। তেমনি—লাল>নাল, চন্দননগর>ইংরেজীতে হয়েছিল Chandernagore। সংস্কৃত পিপীলিকা>পালি কিপিল্লিকা। চুঁচুড়া>(চ্+উঁ+চ্+উ+ড়্+আ)>ইংরাজীতে চিনসুরা Chinsurah (চ+ই+ন্+স্+উ+র্+আ) (এখানে দু'টি

'চ্'-এর মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে 'স্' হয়েছে—এটা ব্যঞ্জনধ্বনির বিষমীভবন। তেমনি দু'টি 'উ'-এর মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে 'ই' হয়ে গেছে—এটা স্বরধ্বনির বিষমীভবন বা স্বরের অসঙ্গতি।

ঘোষীভবন (Voicing): সাধারণত বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্বনি, য়্, র, ল্, হ্, ড়, ঢ় এবং সমস্ত স্বরধ্বনি হল সঘোষ ধ্বনি; আর অন্য ধ্বনিগুলি অঘোষ ধ্বনি। কোনো সঘোষ ধ্বনির প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি যদি সঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে ঘোষীভবন (Voicing) বলে। যেমন—চাকদহ>চাগ্‌দা—এখানে ঘোষধ্বনি 'দ্'-এর প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি 'ক্' পরিবর্তিত হয়ে ঘোষধ্বনি 'গ্'-এ পরিণত হয়েছে। এখানে 'ক্' ও 'দ্'-এর মধ্যে ঘোষবত্তার (voicing) দিক থেকে সমীভবন হয়েছে বলে একে আংশিক সমীভবনও বলতে পারি। এ রকম আংশিক সমীভবনের দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে অনেক পাওয়া যায়। যেমন—দিক্+বিজয়>দিগ্বিজয় ইত্যাদি। তেমনি বাংলা ছোট্‌দিদি>ছোড়্‌দি। এরকম ঘোষধ্বনির প্রভাবে যে অঘোষধ্বনির ঘোষীভবন হয় তা কার্যত আংশিক সমীভবনই। কিন্তু এরকম ঘোষধ্বনির প্রভাব ছাড়াও আপনা থেকেই কোনো-কোনো সময় পশ্চিম বাংলার উচ্চারণে শব্দের শেষে অবস্থিত একক অঘোষধ্বনি সঘোষ উচ্চারিত হয়। একে স্বতোঘোষীভবন (Spontaneous Voicing) বলা যায়। যেমন—কাক>কাগ, লোক>লোগ, ছত্র>ছাত>ছাদ। কিন্তু এরকম ঘোষীভবন সর্বক্ষেত্রে হয় না। যেমন—শোক, হাত ইত্যাদি। ঘোষীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া অঘোষীভবন (Devoicing/Devocalization)। ঘোষধ্বনি অঘোষ উচ্চারিত হলে সেই প্রক্রিয়াকে অঘোষীভবন বলে। যেমন—অবসর>কথ্য বাংলায় অপ্‌সর, ভোঁদা কাকা>দ্রুত উচ্চারণে 'ভোৎকা'; ফারসী খরাব>বাংলা খারাপ, ফারসী গুলাব>বাংলা গোলাপ, বড় ঠাকুর>বট্‌ঠাকুর, পোর্তুগীজ cowve>বাংলা কোপি, জার্মান leben>lieb [lip]।

মহাপ্রাণীভবন (Aspiration): বাংলায় সাধারণত বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি এবং 'হ্' হল মহাপ্রাণ ধ্বনি, আর অন্য ধ্বনিগুলি হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি। সন্নিকটস্থ বা সংযুক্ত কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে যদি কোনো অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ উচ্চারিত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে মহাপ্রাণীভবন (Aspiration) বলে। যেমন—স্তম্ভ>থাম ('স্' লোপ পেয়েছে এবং 'ত্' মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ্'-এর প্রভাবে মহাপ্রাণিত হয়ে 'থ্' হয়ে গেছে)। তেমনি পাঁচ হালা>পাঁছালা ('হ্'-এর প্রভাবে 'চ্' হয়েছে নিকটস্থ 'ছ্')। মহাপ্রাণ

ধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি কোনো অল্পপ্রাণ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে মহাপ্রাণ হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে **স্বতোমহাপ্রাণীভবন** (Spontaneous Aspiration) বলে। যেমন—পুস্তক>পুথি (এখানে 'ত্' পরিবর্তিত হয়েছে 'থ্'-তে, কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব এখানে নেই)। তেমনি—পতঙ্গ>ফড়িং('প্' হয়েছে 'ফ্' কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব ছাড়াই)।

অল্পপ্রাণীভবন (Deaspiration): কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনি যদি অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয় তবে তাকে অল্পপ্রাণীভবন (Deaspiration) বলে। যেমন—শৃঙ্খল>প্রাচীন বাংলা শিংকল>শিকল ('খ্' পরিবর্তিত হয়েছে 'ক্'-তে)। পশ্চিম বাংলার রাঢ়ী উপভাষায় প্রায়ই শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন—দুধ>দুদ, বাঘ>বাগ। পূর্ববাংলার বঙ্গালী উপভাষাতেও এক রকমের অল্পপ্রাণীভবন দেখা যায়। যেমন—ভাই>বাই, ভাত>বাত। পূর্ববাংলার এসব পরিবর্তনে মহাপ্রাণধ্বনি শুধু অল্পপ্রাণ হয়ে যায় না, অবরুদ্ধ বা recursive ধ্বনিতে পরিণত হয়।

কণ্ঠনালীয়ভবন (Glottalization): সাধারণ ফুসফুস-চালিত বহির্মুখী বায়ুপ্রবাহের (Pulmonic Egressive Airstream) দ্বারা সৃষ্ট স্পর্শ ধ্বনি (Stop/Occlusive) যদি রুদ্ধস্বরপথ-চালিত অন্তর্মুখী বায়ুপ্রবাহের (Glottatic Ingressive Airstream) দ্বারা সৃষ্ট অন্তঃস্ফোটক (Implosive) ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে কণ্ঠনালীয়ভবন (Gottalization) বলে। পূর্ববঙ্গের কোনো-কোনো উপভাষায় ভ্, ধ্, ঘ্ পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে অন্তঃস্ফোটক ব্ʼ, দ্ʼ, গ্ʼ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—ভাত>ব'াত, ভাই>ব'াই ইত্যাদি। এই ধ্বনিগুলিকে কেউ-কেউ অবরুদ্ধ (Recursive) ধ্বনি বলেছেন।

নাসিক্যীভবন (Nasalization): কোনো নাসিক্য ব্যঞ্জন (ম্, ন্, ঙ্ ইত্যাদি) যদি ক্ষীণ হতে-হতে ক্রমশ লোপ পায় এবং তার রেশ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতে একটা অনুনাসিক অনুরণন যোগ হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন—বন্ধ (ব্+অ+ন্+ধ্+অ)>বাঁধ (ব্+আঁ+ধ) (এখানে অনুনাসিক ব্যঞ্জন 'ন্' লোপ পেয়েছে, তার ফলে পূর্ববর্তী স্বর 'অ' দীর্ঘ হয়ে অনুনাসিক 'আঁ'তে পরিণত হয়েছে)। তেমনি—অঙ্ক>আঁক, সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ। লাতিন vinum (মদ্য)>ফরাসী vin [vɛ̃] [ভোঁ]।

স্বতোনাসিক্যীভবন (Spontaneous Nasalization): শব্দ-মধ্যে নাসিক্যব্যঞ্জন না থাকলেও অনেক সময় কোনো-কোনো স্বরধ্বনি আপনা থেকেই অনুনাসিক উচ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে স্বতোনাসিক্যীভবন (Spontaneous Nasalization) বলে। যেমন—পুস্তক>পুথি>পুঁথি। (এখানে 'পুস্তক' শব্দে কোনো নাসিক্যব্যঞ্জন নেই, সুতরাং সেটা লোপের প্রশ্নও ওঠে না। তবু 'পুঁথি' শব্দে 'উঁ' ধ্বনিটা আপনা থেকেই অনুনাসিক হয়ে গেছে)। তেমনি—পেচক>পেঁচা ইত্যাদি।

বিনাসিক্যীভবন (Denasalization): অনেক সময় শব্দের অন্তর্গত কোনো নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ পায়, কিন্তু তার কোনো প্রভাব বা রেশ রেখে যায় না। একে বিনাসিক্যীভবন (Denasalization) বলে। যেমন—শৃঙ্খল>শিকল>শেকল (এখানে নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ঙ্' লোপ পেয়েছে, অথচ তার প্রভাবে কোনো স্বর অনুনাসিক হয় নি)। তেমনি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা *পেঙ্‌কে (Peŋqʷe) (=পাঁচ) থেকেই নানা ধাপের মধ্যে দিয়ে ইংরেজী শব্দ 'five'-এর কৃষ্টি; কিন্তু মূলভাষার অনুনাসিক ব্যঞ্জন ঙ্(ŋ) এখানে লোপ পেয়েছে। অথচ লক্ষণীয় যে, এই বিনাসিক্যীভবন একই মূল উৎস থেকে জাত সব ভাষায় হয় নি। যেমন—সংস্কৃতে—পঞ্চ (এখানে 'ঞ্' রয়েছে), জার্মান fünf (এখানে 'n' রয়েছে)। বাংলা 'পাঁচ' এবং ফরাসী cinq [স্যাঁক্]—এখানে আবার নাসিক্যব্যঞ্জনটি লোপ পেয়েছে. কিন্তু পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে দিয়েছে।

মূর্ধন্যীভবন (Cerebralization): 'ঋ', 'র্', 'ষ্' এবং 'ট্', 'ঠ্', 'ড্' প্রভৃতি মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাবে সংশ্লিষ্ট বা কাছাকাছি অবস্থিত কোনো দন্ত্যধ্বনি (ত্, থ্, দ্, ধ্ ইত্যাদি) যদি মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে মূর্ধন্যীভবন (Cerebralisation) বলে। যেমন—বৃদ্ধ > বুড্‌ঢ > বুড়া ('ঋ'-এর প্রভাবে 'দ্' ও 'ধ' যথাক্রমে মূর্ধন্যধ্বনি 'ড্' ও 'ঢ্'-তে পরিণত হয়েছে)। তেমনি—বিকৃত > বিকট, উৎ+ডীন > উড্ডীন ইত্যাদি।

স্বতোমূর্ধন্যীভবন Spontaneous Cerebralisation): 'ঋ', 'র্', 'ষ্' বা 'ট্', 'ঠ্', 'ড্' প্রভৃতি কোনো মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি কোনো দন্ত্যধ্বনি মূর্ধন্যধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে সেই পরিবর্তনকে বলে স্বতোমূর্ধন্যীভবন (Spontaneous Cerebralisation)। যেমন—সংস্কৃত পততি > প্রাকৃত পড়ই > বাংলা পড়ে ইত্যাদি।

বিমূর্ধন্যীভবন (Decerebralisation) : যদি কোনো মূর্ধন্যধ্বনি মূর্ধন্য না থেকে দন্ত্যধ্বনি বা অন্য কোনো প্রকার ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে বিমূর্ধন্যীভবন। যেমন—সংস্কৃত প্রাণ [praɳ] > বাংলা উচ্চারণে প্রান [pran], সংস্কৃত বিষ [biʂ] > বাংলা উচ্চারণে বিশ [biʃ] ইত্যাদি।

তালব্যীভবন (Palatalisation) : সংস্কৃতে ই, ঈ, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্, য্, শ্-কে তালব্যধ্বনি বলা হত (ই-চু-য-শানাম্তালু)। এইসব তালব্যধ্বনির প্রভাবে কোনো দন্ত্যধ্বনি বা অন্য ধ্বনি যদি তালব্যধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে তালব্যীভবন (Palatalisation)। যেমন—সন্ধ্যা > সঞ্ঝা (এখানে য-ফলার প্রভাবে দন্ত্যধ্বনি 'ন্' ও 'ধ্' পরিবর্তিত হয়ে তালব্যধ্বনি যথাক্রমে 'ঞ্' ও 'ঝ্'-তে পরিণত হয়েছে) > সাঁঝ। সংস্কৃত বিষ [biʂ] > খাঁটি বাংলা উচ্চারণে বিশ [biʃ]। institute > ইন্‌স্টিটিউট্। অনেক সময় কোনো তালব্যধ্বনির প্রভাব ছাড়াও দন্ত্য বা দন্তমূলীয় ধ্বনি তালব্যধ্বনিতে পরিণত হয়। এটাকে স্বতোতালব্যীভবন (Spontaneous Palatalisation) বলতে পারি। যেমন—graduate > গ্র্যাজুয়েট।

উষ্মীভবন (Spirantisation) : ধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু পূর্ণ বাধা পেলে স্পর্শধ্বনি (stop) এবং আংশিক বাধা পেলে উষ্মধ্বনি (Spirant/Fricative) সৃষ্ট হয়। স্পর্শধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি এমন হয় যে, শ্বাসবায়ু পূর্ণ বাধা পাচ্ছে না, আংশিক বাধা পাচ্ছে, তবে স্পর্শধ্বনি উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার নাম হল উষ্মীভবন। যেমন—হয়, হয় জানতে পারো না > 'অয় অয় জাণ্ডি পারো না' (জ > z)। কালীপূজা > চট্টগ্রামের উপভাষায় খালি ফুজা [xali fuza]।

সকারীভবন (Assibilation) : উষ্মীভবনের ফলে যদি স্পৃষ্ট বা ঘৃষ্টধ্বনি 'স্', 'শ্' বা 'জ' [s/z]-তে পরিণত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে সকারীভবন (assibilation)। যেমন—আগাপাছতলা > আগাপাস্‌তলা, খেয়েছে > পূর্ব বাংলার উচ্চারণে > খাইসে।

রকারীভবন (Rhotacism) : 'স্' [s] অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে প্রথমে সঘোষ জ [z] এবং পরে 'র' [r]-তে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনকে রকারীভবন (Rhotacism) বলে। যেমন—লাতিন ausosa > *auzoza > aurora। আমাদের ভাষায় আর একরকম রকারীভবনের নিদর্শন পাওয়া যায়—দ্ > ড্ / ড়্ > র্। যেমন—সংস্কৃত পঞ্চদশ > প্রাকৃত পণ্ণডহ > পনর > পনেরো। এই রকম লকারীভবনেরও (Lateralisation) দৃষ্টান্ত কিছু পাওয়া যায়—দ্ > ড্ / ড়্ > ল্। যেমন—ষট্ + দশ > ষোড়শ > ষোল।

সঙ্কোচন (Contraction) : উচ্চারণের দ্রুততার জন্যে অথবা উচ্চারণ-প্রয়াস লাঘব করার জন্যে অনেক সময় আমরা কোনো শব্দের সবক'টি ধ্বনি পূর্ণরূপে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করে কতকগুলি ধ্বনিকে মিলিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করি। এর ফলে অধিক সংখ্যক ধ্বনি স্বল্প কয়েকটি ধ্বনিতে সঙ্কুচিত হয়ে আসে ; একে সঙ্কোচন (Contraction) বলে। যেমন—বৈবাহিক > বেয়াই > ব্যাই, যাহা ইচ্ছা তাই > যাচ্ছেতাই, জামাইবাবু > জাইউ, ব্যবসায়ী > বেব্‌স্যো, পেঁয়াজ > প্যাঁজ।

বিস্ফোরণ বা প্রসারণ (Expansion) : শব্দের দীর্ঘ উচ্চারণের জন্যে শব্দের নির্দিষ্ট সংখ্যক ধ্বনিকে বাড়িয়ে উচ্চারণ করাকে বিস্ফোরণ বা প্রসারণ (Expansion) বলে। যেমন—পর্তুগীজ পেরা > বাংলা পেয়ারা, সংস্কৃত পর্যঙ্ক > ব্রজবুলি পরিযঙ্ক।

বিভাজন (Split) : একটি মূলধ্বনি বা স্বনিমের (Phoneme) যেসব উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি থাকে (Allophones), সেগুলির অবস্থান (distribution) বা ধ্বনিসংযোগের (combination) সর্তগুলি ভাষার গঠনগত পরিবর্তনের ফলে কোনো ক্ষেত্রে উঠে গেলে উপধ্বনিগুলি স্বতন্ত্র স্বনিমের মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে একই স্বনিমের বিভাজন থেকে ভাষায় একাধিক নতুন স্বনিমের প্রতিষ্ঠা ঘটে। যেমন বাংলায় 'ড্' এবং 'ড়্' ছিল একটিই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি মাত্র। এদের অবস্থানের সুনির্দিষ্ট সর্ত ছিল। যেমন—'ড়্' বসবে শব্দের অন্তে অথবা দু'টি স্বরধ্বনির মাঝখানে, আর 'ড্' বসবে অন্যান্য ক্ষেত্রে : একটির জায়গায় অন্যটি বসতে পারবে না। কিন্তু এই সর্তটি এখন বাংলায় কয়েকটি বিদেশী শব্দ বহুপ্রচলিত হওয়ায় একেবারেই উঠে গেছে। ফলে এখন দেখা যায় দু'টি স্বরের মাঝখানে এবং শব্দের শেষেও 'ড্' বসছে। যেমন—রেডিও, রড্। এর ফলে বাংলায় 'ড্' ও 'ড়্' এখন আর একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি নয় ; এখন এ দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম। এইভাবে একই স্বনিম থেকে একাধিক স্বনিমের জন্ম হওয়াকে বিভাজন বলে। এইরকম মধ্যযুগের ইংরেজীতে ঙ্ [ŋ] এবং ন্ [n]

ছিল একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি। কিন্তু এখন এ দু'টি স্বতন্ত্র স্বনিম। বিস্ফোরণ ও বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিস্ফোরণের ফলে বিশেষ শব্দে নতুন ধ্বনির আগম হয় মাত্র, কিন্তু ভাষার সামগ্রিক ধ্বনিসম্পদে একটি নতুন স্বনিম যুক্ত হয় না। বিস্ফোরণে যে ধ্বনিটা বাড়ে সেটা ভাষায় প্রচলিত ধ্বনিসম্পদ থেকেই একটি বা একাধিক ধ্বনি এনে শব্দবিশেষে যোগ করা হয় মাত্র। কিন্তু বিভাজন শুধু শব্দবিশেষে ধ্বনিবৃদ্ধির ব্যাপার নয়। এতে সামগ্রিকভাবে ভাষাতেই একটি নতুন স্বনিম যুক্ত হয়।

একীভবন (Merger) : ভাষার কোনো স্বনিম (Phoneme) যদি তার উচ্চারণগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অন্য কোনো স্বনিমের সঙ্গে এক হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে একীভবন (Merger)। যেমন—সংস্কৃতের মূর্ধন্য 'ণ্' বাংলায় তার উচ্চারণগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এখন দন্ত্য 'ন্'-এর সঙ্গে উচ্চারণের দিক থেকে এক হয়ে গেছে। এইভাবে মূর্ধন্য 'ণ্' ও দন্ত্য 'ন্' বাংলায় আসলে পৃথক্ স্বনিম নয়, একই স্বনিম। সঙ্কোচন ও একীভবন একই প্রক্রিয়া নয়। সঙ্কোচনে কোনো শব্দের ধ্বনিসংখ্যা কমে যায়; কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ভাষার সামগ্রিক ধ্বনিসংখ্যা কমে গেল; কিন্তু একীভবনে ভাষার একটি স্বনিম নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অন্য স্বনিমের সঙ্গে এক হয়ে যায়, এতে ভাষার সামগ্রিক স্বনিম-সংখ্যাই কমে যায়।

অন্যান্য ধ্বনিপরিবর্তন : উপরিউক্ত সূত্রগুলি ছাড়া ধ্বনির রূপান্তরের আরো কয়েকটি সূত্র ক্রিয়াশীল দেখা যায়। যেমন—(ক) 'ন্' স্থানে 'ল্' উচ্চারণ; যেমন—'এবার নামুন'>অশিক্ষিত ব্যক্তির উচ্চারণে 'এবার লামুন'। 'না গো বাবু'>'লা গো বাবু'। পরশুরামের গল্পে ('লম্বকর্ণ') এর একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় :

"বংশলোচন। দেখুন আমার একটি ছাগল আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু—

লাট্টু। আমরা হলুম উলিশটি (<উনিশটি) প্রালী (<প্রাণী), একটা পাঁঠায় কি হবে মশায়? কি বল হে লরহরি (<নরহরি)?

নরহরি। লস্যি, লস্যি (<নস্যি, নস্যি)।"

(খ) 'ল্'-এর 'ন্'-তে পরিবর্তন : লবণ>নুন, লোহা > নোয়া ইত্যাদি।

(গ) 'র্'-এর 'ল্'-তে পরিবর্তন : প্রাচীর >পাঁচিল, সংস্কৃত রাজা> প্রাকৃত লাজা, বৈদিক বম্রী > সংস্কৃত বল্মীক ইত্যাদি।

(ঘ) 'ল্'-এর 'র্'-তে পরিবর্তন : প্রাচীন বাংলা লশুন>আধুনিক বাংলা রসুন।

(ঙ) 'স্'-এর 'হ্'-তে পরিবর্তন : সিন্ধু> হিন্দু ইত্যাদি

ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (Gemination) : কোনো শব্দে জোর দেবার জন্যে আমরা যখন বিশেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাত দিই তখন স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (Gemination) বলে। যেমন—বড় কষ্ট>বড্ড কষ্ট : কোথাও পাবে না>কোথ্থাও পাবে না।

ধ্বনির স্থানান্তর :

বিপর্যাস (Metathesis) : শব্দের মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত বা সংযুক্ত দু'টি ধ্বনি যদি নিজেদের মধ্যে স্থান-বিনিময় করে তবে ধ্বনির সেই স্থান-বিনিময়কে বিপর্যাস (Metathesis) বলে। যেমন—বাক্স (box) >বাস্ক (ব্+আ+স্+ক্+অ) (এখানে 'ক্' ও 'স্' নিজেদের মধ্যে স্থান-বিনিময় করেছে)। তেমনি—রিক্‌শা (rickshow)>রিশ্‌কা, বারাণসী>হিন্দী বনারস>ইংরেজী বেনারস >(Benaras)। অনেক সময় গোটা ধ্বনির বিপর্যাস না হয়ে তার একটি বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের বিপর্যাস হয়। যেমন—গর্দভ > গদ্দহ (গ্+অ+দ্+দ্+অ+হ্+অ)>গাধা (গ্+আ+ধ্+আ) ('হ্' ধ্বনি একটি মহাপ্রাণ ধ্বনি, এর মহাপ্রাণতা আগে সরে এসে 'দ্'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এর ফলে 'দ্' হয়েছে 'ধ্')। তেমনি আধিক্যতা > আদিখ্যেতা ইত্যাদি।

দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস / স্পুনারিজম্ (Spoonerism) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি ধ্বনির যেমন স্থান-বিনিময় হয় তেমনি একটি বাক্যের মধ্যে পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত ধ্বনির মধ্যেও পারস্পরিক স্থান-বিনিময় ঘটে। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস বা বাক্যের অন্যোন্য ধ্বনিবিপর্যাস বলতে পারি। অক্সফোর্ডের ডঃ স্পুনারের উচ্চারণে এরকম ধ্বনিবিপর্যাস প্রায়ই ঘটত বলে এই প্রক্রিয়াটিকে ভাষাবিজ্ঞানে স্পুনারিজম্ (Spoonerism) বলে। ভাষাবিজ্ঞানী তারাপুরওয়ালা উল্লেখ করেছেন—একবার একটি ছাত্রকে বকতে গিয়ে তিনি বলতে চেয়েছিলেন—ছাত্রটি গোটা বছরটাই নষ্ট করেছে—Wasted a whole term—এই কথাটি বলতে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন—tasted a whole worm। এখানে t ও w—এই দু'টি দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস ঘটেছে। বাংলায় তাড়াতাড়িতে অনেক সময় 'এক কাপ চা' বলতে গিয়ে আমরা বলে ফেলি 'এক চাপ কা'। গলে জল হয়ে গেছে>জলে গল হয়ে গেছে।

অপিনিহিতি (Epenthesis) : অনেক সময় শব্দের মধ্যে 'ই' (ি) বা 'উ' (ু) থাকলে, সেটি যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সেই ব্যঞ্জনের আগে সরে এসে উচ্চারিত হয়। এছাড়া শব্দে য-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন বা 'ক্ষ' বা 'জ্ঞ' থাকলে তার আগে অনেক সময় একটা অতিরিক্ত 'ই' বা 'উ'-উচ্চারিত হয়। এই উভয় প্রক্রিয়াকে অপিনিহিতি বলে। অপিনিহিতিতে শব্দের মাঝখানে যেখানে একটি অতিরিক্ত স্বর যোগ হয় সেখানে অপিনিহিতিও কার্যত একরকমের মধ্যস্বরাগম। যেমন—বাক্য (ব্+আ+ক্+য্+অ)> বাইক্ক (ব্+আ+ই+ক্+ক্+অ)। অন্য ক্ষেত্রে অপিনিহিতি হল স্বরধ্বনির স্থানান্তর (vowel transfer)। যেমন—করিয়া (ক্+অ+র্+ই+য়্+আ)>কইর‍্যা (ক্+অ+ই+র্+য্+আ)—এখানে যে 'ই' র্-এর পরে ছিল সেটি র্-এর আগে স্থানান্তরিত হয়েছে। অনেকে এই অপিনিহিতিকে স্বর ধ্বনির বিপর্যাস বলেছেন। কিন্তু এটা দু'টি স্বরধ্বনির পারস্পরিক স্থান বিনিময় নয়, একটি ধ্বনির স্থানান্তর।

ভাষার অন্তরঙ্গ ও অর্থপ্রভাবিত কারণে ধ্বনিপরিবর্তন

সাদৃশ্য (Analogy) : মনে রাখার সুবিধার জন্যে বা উচ্চারণ-বৈষম্য হ্রাস করার জন্যে যখন আমরা কোনো ধ্বনি বা রূপ বা অর্থকে অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে তার সাদৃশ্যে শব্দের পরিবর্তন করে নিই বা একটি কোনো শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা অনুরূপ কোনো নতুন শব্দ গড়ে নিই তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে সাদৃশ্য (Analogy)। সাদৃশ্যের ফল চার রকম হতে পারে—(১) শব্দের ধ্বনিপরিবর্তন, (২) শব্দের রূপপরিবর্তন, (৩) শব্দের অর্থপরিবর্তন এবং (৪) নতুন শব্দসৃষ্টি। বাংলায় বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ 'টাকার কুমীরে'র 'কুমীর' শব্দটি এসেছে ধনসঞ্চয়ের দেবতা 'কুবের' থেকে। সুতরাং বাংলায় পদগুচ্ছটি হওয়া উচিত ছিল 'টাকার কুবের' বা 'টাকার কুবীর'। কিন্তু বাংলায় হয়েছে 'টাকার কুমীর'। এখানে 'কুবীর' শব্দটি 'কুমীর' শব্দের সাদৃশ্যে পরিবর্তিত হয়ে এইরূপ লাভ করেছে—এখানে 'ব্' থেকে 'ম্' এই ধ্বনি-পরিবর্তনটি সাদৃশ্যের প্রভাবেই ঘটেছে। 'র্' থেকে 'ল্' হওয়ায় সংস্কৃত 'প্রাচীর' থেকে বাংলায় 'প্রাচীর' হওয়া উচিত ছিল 'পাচীল' (র্>ল্), কিন্তু বাংলায় আরো পরিবর্তন হয়ে শব্দটি হয়েছে 'পাঁচীল', এখানে 'পাঁচ' শব্দের সাদৃশ্যে স্বতোনাসিকীভবন হয়েছে। 'পাঁচ'-এর প্রভাবে এই পরিবর্তনটাই সাদৃশ্যের নিদর্শন। প্রাচীন বাংলায় উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের সর্বনামের সম্বন্ধ পদের রূপ ছিল যথাক্রমে 'আহ্মার' ও 'তোহ্মার'। এই দু'টি পদের সাদৃশ্যে প্রাচীন বাংলায় 'সবার' শব্দের বিকল্প রূপ গড়ে উঠেছিল 'সহ্মার'। 'হাঁস' ও 'পাতাল' এই দু'টি শব্দের সাদৃশ্যে ইংরেজী শব্দ 'হস্পিট্যাল্' (hospital) বাংলায় হয়েছে 'হাঁসপাতাল'।

সাদৃশ্যের প্রভাব শব্দরূপের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সংস্কৃতে 'নর' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের রূপ 'নরস্য', কিন্তু 'মুনি' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের রূপ 'মুনেঃ'। প্রাকৃতে কিন্তু ঐ 'নরস্স' রূপের সাদৃশ্যে 'মুনি' শব্দেরও ষষ্ঠীর একবচনে হয়েছিল 'মুণিস্স'। আদিমধ্য যুগের বাংলায় '-রা' বিভক্তি যোগ করে শুধু সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনের রূপ গড়া হত। যেমন—আহ্মারা, তোহ্মারা ইত্যাদি। (কিন্তু প্রাচীন ও আদিমধ্য বাংলায় বিশেষ্য পদের কর্তৃকারকের বহুবচন রূপ করা হত সমষ্টিবাচক পদ যোগ করে বা অন্যভাবে। যেমন—'সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই' সকল সমাধি দিয়ে কি করা যায় ?) এর সাদৃশ্যে অন্ত্যমধ্য বাংলায় বিশেষ্যেরও কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ ক্রমশ '-রা' বিভক্তি যোগে রচিত হতে থাকে। যেমন—রাজারা। সাদৃশ্যের প্রভাবে ভাষায় আরো দু'রকম প্রক্রিয়া ঘটে— পুরানো শব্দের অর্থপরিবর্তন এবং নতুন শব্দসৃষ্টি। ধ্বনিপরিবর্তনের ধারায় এই দু'টি প্রক্রিয়া যদিও পড়ে না তবু সাদৃশ্যের সামগ্রিক প্রভাব বোঝাবার জন্যে প্রক্রিয়া দু'টি এখানে ব্যাখ্যা করা হল। বৈদিক শব্দ 'ক্রন্দসী'র মূল অর্থ ছিল 'গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সৈন্য।'[২২] আবার বৈদিক 'রোদসী' শব্দের অর্থ হল 'দুই জগৎ' (স্বর্গ ও পৃথিবী)>অন্তরীক্ষ।[২৩] এই 'রোদসী' শব্দের সাদৃশ্যে 'ক্রন্দসী' শব্দটির নতুন অর্থ রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'অন্তরীক্ষ'। রবীন্দ্র-প্রয়োগে রোদসী শব্দের সাদৃশ্যে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটেছে।

২২। যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ ॥
—ঋগ্বেদ-সংহিতা ২।১২।৮

—'হে মনুষ্যগণ! গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সেনাদল পরস্পর সঙ্গত হয়ে যাঁকে আহ্বান করে, উত্তম ও অধম শত্রুগণ যাঁকে আহ্বান করে, একবিধ রথারূঢ় দু'জনই যাঁকে নানাপ্রকারে আহ্বান করে, তিনিই ইন্দ্র।' —এখানে বৈদিক 'ক্রন্দ' ধাতুর অর্থ 'গর্জন করা' (bellow)—Macdonell: *A Vedic Reader for Students*, 1970, p. 230.

২৩। অয়ং দেবানামপসামপস্তমো যো জজান রোদসী বিশ্বশম্ভুবা।
—ঋগ্বেদ-সংহিতা ১।১৬০।৪

—তিনি দেবগণের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয়, তিনি দুই জগৎ (স্বর্গ-পৃথিবী) সৃষ্টি করেছেন, সেই জগৎ সকলের পক্ষে কল্যাণকর।

সাদৃশ্যের প্রভাবে ভাষায় নতুন শব্দ সৃষ্টির অনেক উদাহরণ ভাষাবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন—মূল শব্দ 'বধূটি' থেকে বাংলায় ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে এসেছে 'বউড়ী'। এই বউড়ী শব্দের সাদৃশ্যে বাংলায় 'শাশুড়ী', 'ঝিউড়ী' প্রভৃতি নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে সাদৃশ্যের প্রভাবে নতুন শব্দ সৃষ্টির একটি মজার উদাহরণ পাওয়া যায়। নাটকটির একটি চরিত্র রামমাণিক্য ইংরেজী শিখতে গিয়ে পুংলিঙ্গের সর্বনাম 'হিম্' (him) শব্দের সাদৃশ্যে স্ত্রীলিঙ্গে 'শিম্' (shim) শব্দ সৃষ্টি করতে চায়! সে বলে—"মর্দাগোর পের্‌লাউনে 'হি, হিজ্, হিম্' অইচে; মাইয়াগোর নামে 'শি, হার্, হার্' কইচে; যদি মর্দাগোর পের্‌লাউনে 'হি, হিজ্, হিম্' অইল, তবে মাইয়াগোর 'শি, শিজ্, শিম্' অইব না ক্যান?" এই রকম নতুন শব্দ সৃষ্টির আরো একটি মজার উদাহরণ দিয়েছেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ আই. জে. এস্. তারাপুরওয়ালা। একসময় দু'টি ছেলের মধ্যে কোনো বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল। তর্কের সময় একজন অন্য জনের যুক্তি অস্বীকার করে জোরের সঙ্গে বলল—No, it is not (না, এমনটি হতে পারে না)। তার উত্তরে আবার অন্য পক্ষটি আরো জোরের সঙ্গে বলল—Yes, it is sot (হ্যাঁ, এটা তা-ই)। এই যে 'sot' শব্দটি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে এইটা 'not' শব্দের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

বিমিশ্রণ / মিশ্রণ (Contamination) : যদি একটি শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে তার সঙ্গে ভাবানুষঙ্গের জন্যে অন্য কোনো শব্দ মনে এসে যায় এবং মূল শব্দের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে সেই জায়গায় মনে-আসা শব্দটি যোগ করে দেওয়া হয় এবং তার ফলে একটি নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়, তবে তাকে বিমিশ্রণ / মিশ্রণ (Contamination) বলে। যেমন—পর্তুগীজ আনানস (annanas) শব্দের 'নস' অংশটুকু বাদ দিয়ে তার জায়গায় বাংলা 'রস' শব্দ যোগ করা হয়েছে এবং তার ফলে 'আনারস' শব্দটি সৃষ্ট হয়েছে। এখানে যে ফলের কথাটি বলা হয়েছে তার মধ্যে রস থাকে বলে বাংলা 'রস' শব্দটির কথা মনে এসেছে। এখানে 'আনানস' ও 'রস' শব্দের মিশ্রণে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে—'আনারস'।

জোড়কলম শব্দ (Portmanteau Word) : একটি শব্দের বা তার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দ বা তার অংশবিশেষ যোগ করে যদি একটি নতুন শব্দ তৈরী করা হয় তবে সেই শব্দকে বলে জোড়কলম শব্দ (Portmanteau word)। যেমন—আরবী 'মিন্নৎ' শব্দের প্রথমাংশের সঙ্গে সংস্কৃত 'বিজ্ঞপ্তি' শব্দের শেষাংশ যোগ করে করা হয়েছে 'মিনতি'। বাংলা তফাৎ+ইংরেজী difference>তফারেন্স্। 'নিশ্চল' শব্দের প্রথমাংশের সঙ্গে 'চুপ' শব্দটি যোগ করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন 'নিশ্চুপ' শব্দ। রবীন্দ্রনাথ আরও সৃষ্টি করেছেন—ঝট্+তড়িৎ=ঝটিৎ। এখন বহু প্রচলিত ধোঁয়া+কুয়াশা=ধোঁয়াশা, Smoke+Fog=Smog, India+European=Indo-European. সুকুমার রায়ের একটি কবিতায় জোড়কলম শব্দের চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় :

> "হাঁস ছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
> হয়ে গেল "হাঁসজারু" কেমনে তা জানি না।
> বক কহে কচ্ছপে—'বাহবা কি ফুর্তি !
> অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি ॥"

বিমিশ্রণ ও জোড়কলমের মধ্যে গঠন-প্রক্রিয়ার দিক থেকে সাদৃশ্য আছে, পার্থক্য শুধু অর্থগত। বিমিশ্রণে যে দু'টি শব্দের যোগ হয় সেই শব্দ দু'টির অর্থ প্রায় একই রকম নয়, বা শব্দ দু'টি প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণও নয়। যেমন—'আনানস' ও 'রস' শব্দ দু'টির অর্থ একই রকম নয়, বা কাছাকাছিও নয়, একটি হল ফলের নাম, অন্যটি আস্বাদের; শুধু ভাবের অনুষঙ্গ আছে, একটির কথা বললে অন্যটির কথা মনে পড়ে। কিন্তু জোড়কলম শব্দে যে দু'টি শব্দের যোগ সাধন ঘটে সেই শব্দ দু'টির অর্থ প্রায় একই রকম, বা শব্দ দু'টি প্রায় সমান গুরুত্বসম্পন্ন। যেমন—'ধোঁয়া' ও 'কুয়াশা' প্রায় একই রকম জিনিস, দু'য়ে মিলে 'ধোঁয়াশা'। India ও Europe-এর মধ্যে যদিও একটি হল দেশের নাম, অন্যটি মহাদেশের নাম, তবু দু'টিই স্থানের নাম, দু'য়ের মিলনে Indo-Europe, তা থেকে Indo-European।

সঙ্কর শব্দ (Hybrid Word) : বিভিন্ন ভাষার উপাদান যোগ করে একটি নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে সঙ্কর শব্দ বা মিশ্র শব্দ (Hybrid Word) বলে। যেমন—ইংরেজী শব্দ 'মাস্টার' (Master)+বাংলা প্রত্যয় 'ঈ'=মাস্টারী; বাংলা পুরঃসর্গ 'নি'+ফারসী শব্দ 'খরচা'=নিখরচা। বিমিশ্রণ ও জোড়কলমে দু'টি বা একটি শব্দের অংশবিশেষ নেওয়া হয়, কিন্তু সঙ্কর শব্দে যে উপাদানটি নেওয়া হয় সেটি গোটাই নিয়ে যোগ করা হয়।

লোকনিরুক্তি (Folk Etymology) : নিরুক্তি মানে ব্যুৎপত্তি বা উৎস-নির্ণয়। শিক্ষিত মানুষের নয়, লোক-সাধারণের অর্থাৎ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে নির্ণীত ব্যুৎপত্তির উপরে

নির্ভর করে শব্দের যে ধ্বনিপরিবর্তন হয় তাকে লোকনিরুক্তি (Folk-Etymology) বলে। যেমন—বৈদিক ভাষায় 'মাকড়সা'র প্রতিশব্দ ছিল 'ঊর্ণবাভ'। এই মূল শব্দটি 'বভ্' (=বয়ন করা) ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এই 'বভ্' ধাতু পরে অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং লোক-সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস গড়ে উঠে যে মাকড়সা নিজের 'নাভি' থেকে সূতোর মতো একরকম লালা বের করে তা থেকে জাল রচনা করে। লোক-বিশ্বাসের ঐ 'নাভি' শব্দের উপরে ভিত্তি করে শব্দটির নতুন ব্যুৎপত্তি করে নেওয়া হয় এবং 'ঊর্ণবাভ' শব্দটির সেই অনুযায়ী ধ্বনিপরিবর্তন হওয়ায় শব্দটি হয়ে যায় 'ঊর্ণনাভ'। তেমনি ধনসঞ্চয়ের দেবতা হলেন 'কুবের'। স্বর-সঙ্গতির ফলে 'কুবের' হয়েছে 'কুবীর'। এই 'কুবীর' নিয়ে বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ হওয়া উচিত ছিল 'টাকার কুবীর'। কিন্তু বাংলায় এটি পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিয়েছে 'টাকার কুমীর'। কুমীরের পেটে জলে-ডোবা মানুষের টাকা-পয়সা জমা থাকে এবং কেউ তার সন্ধান পায় না—এই লোক-বিশ্বাসের ফলে 'কুমীর' শব্দের উপরে নির্ভর করে শব্দটির নতুন ব্যুৎপত্তি ধরে নেওয়া হয়েছে এবং শব্দগুচ্ছটি হয়েছে 'টাকার কুমীর'। এই রকম 'আর্ম চেয়ার (Arm chair) হয়েছে 'আরাম চেয়ার' বা 'আরাম কেদারা'। আর্ম চেয়ারে বসলে আরাম পাওয়া যায় এই ধারণার বশে 'আর্ম' হয়েছে 'আরাম'।

শব্দবিভ্রম (Malapropism) : কখনো-কখনো অজ্ঞানতাবশত একটি শব্দের বদলে তার জায়গায় প্রায় সমধ্বনিযুক্ত অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। একেই বলে শব্দবিভ্রম (Malapropism)। যেমন—'আমার একটি নীতি আছে'—এই অর্থে অনেক লোককে বলতে শোনা যায়—'আমার একটি প্রিন্সিপ্যাল্ আছে'; আসলে এখানে হবে 'আমার একটি প্রিন্সিপল্' (Principle) আছে। প্রিন্সিপ্যাল্ (Principal) মানে 'অধ্যক্ষ', প্রিন্সিপল্ (principle) মানে 'নীতি'। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে 'উদ্বাহ বন্ধনে' বলতে গিয়ে একটি চরিত্র বলে ফেলেছে 'উদ্বন্ধনে' ('তোমার সহিত উদ্বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাই')। 'উদ্বাহ বন্ধন' মানে 'বিবাহ বন্ধন' আর 'উদ্বন্ধন' মানে 'গলায় দড়ি'! শব্দবিভ্রমের ফলে এরকম হাস্যকর পরিবর্তন প্রায়ই দেখা যায়। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনে কালীবাবু বলেছেন—জাতীয় ভাষা সংস্কৃত চর্চার জন্যে তাঁরা জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা স্থাপন করেছেন। কিন্তু কর্তা মহাশয় যখন জিজ্ঞেস করলেন—সেখানে 'তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি ?' তখন কালীবাবু বললেন—'আজ্ঞে শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর বোপদেবের বিন্দা দূতী'। আসলে কালীবাবু মূর্খ,

তিনি 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'কে বলছেন—'শ্রীমতী ভগবতীর গীত' আর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে বলছেন—'বোপদেবের বিন্দা দূতী'।

বিষমচ্ছেদ বা ভ্রান্তবিশ্লেষ বা নিষ্কালন (Metanalysis) : শব্দের অন্তর্গত উপাদানগুলির বা শব্দের ব্যুৎপত্তির সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলে আমরা অনেক সময় শব্দকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করি যাতে শব্দটিকে ঠিক-ঠিক অংশে ছেদন না করে ভুল অংশে ছেদন করে ফেলি এবং ঐ ভ্রান্ত অংশগুলি নিয়ে আবার নতুন শব্দ গঠন করে ফেলি। এই প্রক্রিয়াকে বলে বিষমচ্ছেদ বা ভ্রান্তবিশ্লেষ বা নিষ্কালন (Metanalysis)। যেমন—একজন জনপ্রিয় অধ্যাপকের আসল নাম শ্রীযুক্ত বাবুরাম প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। নামটি একবার টাইপে ভুল জায়গায় বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে হয়ে গিয়েছিল শ্রীযুক্তবাবু রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনি টাইপের ভুলেই একবার God is now here হয়ে গিয়েছিল God is no where ; শুধু 'now'-এর 'w' বিশ্লিষ্ট হয়ে here-এর সঙ্গে যোগ হয়ে যাওয়ায় বাক্যটির অর্থই উল্টে গেছে! এসব হল আকস্মিক (casual) বিষমচ্ছেদ। ভাষায় এরকম বিষমচ্ছেদের ফলে স্থায়ীভাবে নতুন শব্দসৃষ্টি হতে পারে যেমন—সংস্কৃত নিধুবন (নি+ধুবন) শব্দের মূল অর্থ 'রমণ' অর্থাৎ 'কামকেলি' (দ্রঃ 'A Trilingual Dictionary' by Dr. Gobindagopal Mukhopadhyay and Dr. Gopikamohan Bhattacharya, 1966, p. 204)। কিন্তু 'বন' শব্দের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্যবশত জনচেতনায় এই শব্দের গঠন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে, ফলে শব্দটির গঠন ভ্রান্তভাবে বিশ্লেষণ করা হয়—'নিধু+বন' এবং শব্দটির ভ্রান্ত অর্থও করা হয়—'কেলি-কানন' (অশুদ্ধ কিন্তু সুপ্রচলিত—'চলন্তিকা'—রাজশেখর বসু, ১৩৭০, পৃঃ ৩৬০)। যে শব্দের মূল গঠন ছিল 'নি+ধুবন' (নি=নিশ্চয়তাবাচক উপসর্গ, ধুবন=হস্তপদাদিচালন, অগ্নি, কামাগ্নি=fire of passion) সেই শব্দকে বিশ্লেষণ করা হয় 'নিধু+বন' রূপে—এটাই ভ্রান্তবিশ্লেষ বা বিষমচ্ছেদ। তেমনি বৈদিক 'অসুর' (তুলনীয় : আবেস্তার আহুর') মূলত একটি অখণ্ড মৌলিক শব্দ—ভ্রান্তজ্ঞানের ফলে এই শব্দের 'অ'-কে নঞর্থক উপাদান ধরে নিয়ে মূল শব্দ থেকে 'অ'-কে বিশ্লিষ্ট করে নতুন শব্দ 'সুর' (দেবতা) সৃষ্টি করা হয়েছে। আরবী 'নারাঙ্গ' ইংরেজীতে গৃহীত হয়েছিল 'norange' রূপে। তার সঙ্গে article যোগ করে হল 'a norange'। পরে ভ্রান্ত বিশ্লেষের ফলে 'norange'-এর প্রথম 'n' বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববর্তী article 'a'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। ফলে হল 'an orange,' আর article বাদ দিয়ে শব্দটি দাঁড়াল 'orange' (কমলা লেবু)।

ভুয়া শব্দ (Ghost Word) : অনেক সময় শব্দের একটা কল্পিত মূল উপাদান খাড়া করে নিয়ে তার সঙ্গে বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি যোগ করে এমন শব্দ গঠন করা হয় যার মূল উৎস ভাষায় ছিলই না। যেমন—'প্রোথিত' শব্দ। এখানে কল্পিত মূল উপাদান হচ্ছে 'প্রোথ্' ধাতু। এর সঙ্গে '-ইত' যোগ করে হয়েছে 'প্রোথিত'। কিন্তু এর মূল যে 'প্রোথ্' ধাতু সেটি কাল্পনিক ধাতু, সংস্কৃতে এর উৎস পাওয়া যায় না।

পুনর্গঠন বা পূর্বস্তরীয় গঠন (Back Formation) : কোনো বিদেশী বা নতুন শব্দকে পরিবর্তিত করে নিজের দেশের প্রাচীন ভাষার ছাঁদে নতুন রূপে গড়ে তোলাকে বলে পুনর্গঠন বা পূর্বস্তরীয় গঠন (Back Formation)। যেমন—গ্রীক 'দ্রাখ্মে' থেকে সংস্কৃত 'দ্রম্য', গ্রীক 'কামেলস্' (kamelos) থেকে সংস্কৃত 'ক্রমেলক', পর্তুগীজ viola থেকে সাধু বাংলা বেহালা, জার্মান মাক্স্‌ম্যুলর্ (Max Müller) থেকে সাধু বাংলায় 'মোক্ষমূলর'।

সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তন (Convergent Phonemic Change) : ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে যদি একাধিক শব্দ পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারণ ও বানানে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করে তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে সমমুখ ধ্বনি-পরিবর্তন (Convergent Phonemic Change) বলে। যেমন—সংস্কৃত পততি >বাংলা পড়ে (falls), সংস্কৃত পঠতি>বাংলা পড়ে (reads)। এখানে দু'টি শব্দ 'পততি' ও 'পঠতি' ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করেছে—'পড়ে'। তেমনি সখী>সই, সহি>সই ; ব্যাকুল>বাউল, বাতুল>বাউল। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে শব্দগুলি যে রূপ লাভ করে তাকে সমরূপ শব্দ (Homonym) বলে। ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে একাধিক শব্দের পরিবর্তিত রূপ যদি ধ্বনির দিক থেকে অর্থাৎ উচ্চারণের দিক থেকে একই রকম হয়ে যায়, শুধু লেখার বানানে পৃথক্ থাকে তবে সেই পরিবর্তিত রূপকে সমোচ্চারিত বা সমধ্বনি শব্দ (Homophone) বলে। যেমন—শ্রবণ>শোনা [ʃona], সুবর্ণ>সোনা [ʃona]। এরকম ঐতিহাসিক সমমুখ পরিবর্তন ছাড়াও যদি দেখা যায় যে দু'টি শব্দের মধ্যে উচ্চারণগত বা ধ্বনিগত মিল আছে, শুধু বানান ও অর্থে পার্থক্য আছে তা হলেও সেই শব্দ দু'টিকে সমোচ্চারিত বা সমধ্বনি শব্দ (Homophone) বলে। যেমন—বন [bo:n] (=অরণ্য), বোন [bo:n] (=ভগিনী) ; বিষ [bi:ʃ] (=poison), বিশ [bi:ʃ] (=twenty) ; কুল [ku:l] (=বংশ), কূল [ku:l] (=নদীর তীর) ইত্যাদি।

বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন (Divergent Phonemic Change) : একই শব্দ যদি ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে একাধিক রূপ লাভ করে অর্থাৎ ধ্বনির পরিবর্তনের ফলে যদি একই শব্দ থেকে একাধিক শব্দের জন্ম হয় তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন (Divergent Phonemic Change) বলে। যেমন—ভণ্ড>ভান ও ভাঁড়, চিত্র>চিতা ও চিত্তির, শ্রদ্ধা>সাধ ও ছেদ্দা।

এভাবে যে কোনো কারণে ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে বা এরকম পরিবর্তন ছাড়াই যদি দেখা যায় যে দু'টি শব্দের একই রকম রূপ, তা হলে সেই শব্দ দু'টিকে যমক (Doublet) বলে, যেমন—পড়ে (reads) ও পড়ে (falls) ; যদি তিনটি শব্দের একই রূপ হয় তবে তাদের ত্রিক (Triplet) বলে, যেমন—কর (উপাধি), কর (তুই কর), কর (ট্যাক্স্) ; এরকম তিনের বেশী শব্দের রূপ একই রকম হলে তাকে গুচ্ছক (Multiplet) বলে। যেমন—কড়া (কঠিন), কড়া (পায়ের কড়া), কড়া (রান্নার কড়া), কড়া (দরজার রিং)।

॥ ৩৪ ॥

শব্দার্থতত্ত্ব ও অর্থপরিবর্তনের ধারা
(Semantics and Change of Meaning)

ভাষার দু'টি দিক হচ্ছে : তার বাইরের প্রকাশরূপ (expression aspect) এবং তার ভিতরের ভাব বা অর্থ (content aspect)। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার এই অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics বলে। কোনো-কোনো বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার শুধু বাইরের গঠনের (Structure) উপরে জোর দেন এবং শব্দার্থকে ভাষাবিজ্ঞানের বহির্ভূত বলে উপেক্ষা করেন। তাঁদের মতে শব্দের অর্থ বা ভাব মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে, এবং যেহেতু মানুষের মনের খেলাকে বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা যায় না, সেহেতু শব্দার্থতত্ত্বকে ঠিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাই তাঁরা শব্দার্থতত্ত্বকে (Semantics) ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে আনতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আব্রাহাম্ নোয়াম্ চম্‌স্কি